দৈনিক খবর
তারিখ 27 AUG 1993

# উচ্চ কৃষি শিক্ষা ঃ একটি বাস্তবমুখী পর্যালোচনা

অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা

বাংলাদেশে দু'ধরনের উচ্চ কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। যথা– (১) বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেম এবং (২) অধিভুক্ত কলেজ–সিস্টেম। সাংগঠনিক কাঠামো, ক্ষমতা ও শিক্ষার পরিবেশ বিভিন্ন সিস্টেমে বিভিন্ন রকম। তবে দু'টি সিস্টেমেরই মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে গুণগত মানের কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরী করা। এই কৃষি গ্রাজুয়েটগণ তাঁদের যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন পেশা বেছে নেন। তারা কৃষি কলেজ বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন, কৃষি গবেষণার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী হতে পারেন। আবার সম্প্রসারণ সার্ভিসের বিশেষজ্ঞ বা কর্মী হতে পারেন। কৃষি কলেজ বা বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যত ভাল হবে কৃষি গ্রাজুয়েটগণ ততই অর্জিত জ্ঞান দ্বারা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারবেন। এই লক্ষ্য অর্জনের অর্থ হচ্ছে দেশের কৃষির সামগ্রিক উন্নতি করা। আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে কৃষি শিক্ষার কাজ হচ্ছে কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরী করা, কৃষি গবেষণার কাজ হচ্ছে কৃষি সমস্যার উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষকদের উপযোগী প্রযুক্তি আবিষ্কার করা এবং কৃষি সম্প্রসারণের কাজ হচ্ছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রযুক্তিগুলো কৃষকদের অবগত করা, শিক্ষা দেয়া, ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, উৎপাদন সমস্যা সংগ্রহ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা। কিন্তু আমরা যদি বাস্তব অবস্থাটা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে দু'টি সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য রেখে যে গ্রাজুয়েট তৈরী হচ্ছে তাদের পক্ষে একইভাবে উক্ত কাজগুলো করা সম্ভব নয়।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মানের কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরী কৃষি উন্নয়ন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত। আমরা যদি মেডিকেল কলেজগুলোর দিকে তাকাই তবে দেখব প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজের প্রায় একই রকম সুযোগ–সুবিধা বিদ্যমান। ছাত্রদের মেধা ভিন্ন হলেও শিক্ষা পদ্ধতি, উপকরণ, প্রশাসন, নিয়ম–নীতি, পরীক্ষা পদ্ধতি এসবের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। যদি মারাত্মক পার্থক্য থাকে তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসবে এবং হাসপাতালগুলোতে মৃতের সংখ্যা অনেক বাড়বে। ঠিক তেমনি কমবেশী একই গুণগত মানের কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরী না হলে উন্নয়নের গতি বা শ্লথ হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান কৃষি শিক্ষাকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এমন ব্যবস্থাধীনের আওতায় আনতে হবে যেখানে শিক্ষার প্রতিযোগিতা থাকবে অথচ অবকাঠামো ক্ষমতা ও শিক্ষার পরিবেশগত পার্থক্য থাকবে না। অত্র নিবন্ধে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত কলেজ সিস্টেমে কৃষি শিক্ষার মধ্যে যে বৈষম্যগুলো রয়েছে তা উদঘাটন করার চেষ্টা করবো এবং বিকল্প ব্যবস্থার একটা প্রস্তাব রাখব।

**বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেম ঃ** বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১ সাল হতে এ দেশে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা দিয়ে আসছে। এটি একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যাবতীয় সুযোগ–সুবিধা ভোগ করে থাকে। অবকাঠামোগত দিক থেকে দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বড় বা সমকক্ষ। এর আয়তন ১২০০ একর। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় ৬টি অনুষদ রয়েছে; যথা ঃ কৃষি অনুষদ, পশুপালন অনুষদ ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ, মৎস্য অনুষদ, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ এবং কৃষি প্রকৌশল ও খাদ্য প্রযুক্তি অনুষদ। অনুষদগুলোর প্রতিটিতে প্রায় ১৫টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগ ২০–২৫ জন শিক্ষক মন্ডলী নিয়ে গঠিত এবং প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীসহ নিজস্ব অফিস রয়েছে। বিভাগীয় শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে ৪–৬ জন অধ্যাপক, ৮–১০ জন সহযোগী অধ্যাপক, ২/১ জন প্রভাষক ব্যতীত বাদবাকী সকলেই সহকারী অধ্যাপক। অবকাঠামোগত সুযোগ–সুবিধা থাকার জন্য প্রতিটি বিভাগের গবেষণা প্রজেক্ট আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থ ছাড়াও এই প্রজেক্টগুলো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিভিন্ন দাতা দেশের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, আর্থিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষমতা। বিশ্ববিদ্যারয়ের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে এর অর্ডিন্যান্স, স্টেডিউটস এবং ক্যালেন্ডার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ অর্ডিন্যান্স মোতাবেকেই হয়ে থাকে। ক্ষমতাগুলো ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কমিটি এবং পরিষদের মাধ্যমে। সেগুলো হচ্ছে সিন্ডিকেট, ডীন পরিষদ, একাডেমিক কাউন্সিল, বোর্ড অব স্টাডিজ, পরীক্ষা কমিটি, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কমিটি ইত্যাদি। এই কমিটিগুলো কৃষি শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিগুলোতে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা অধিভুক্ত কলেজগুলোর পক্ষে সুবিধাজনক না হলেও হুবহু মানতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দই কমিটিগুলোর সদস্য। তারাই সিলেবাস প্রণয়ন করেন। পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র তৈরী করেন; মডারেশন করেন, উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন– এমনকি প্রয়োজন মনে করলে তারা ছাত্রদেরকে নানা রকম পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করতে পারেন। কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করতে পারেন আবার বাতিলও করতে পারেন। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা এবং স্থগিত করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত কলেজগুলোর অসুবিধার কথা বিবেচনা করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৮৮ সালের বন্যায় সারা বাংলাদেশই জলমগ্ন ছিল। বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতাবলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখেছে এবং ক্যারিওভার পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউটের অসুবিধার কথা একটুও বিবেচনা করেননি।

সম্প্রতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলাম–এর পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অধিভুক্ত কলেজগুলোর শিক্ষকদের মতামত রাখার সুযোগ দেয়া হয়নি। যা হোক, কোর্স কারিকুলামে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা থেকে কৃষকদের কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন, গরু–মহিষ, ছাগল– ভেড়া, হাঁস–মুরগী প্রতিপালন করেন এবং মাছেরও চাষ করেন, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Integrated Farming system. সুতরাং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসও তেমনি Integrated হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কৃষি অনুষদের সিলেবাসে কখনও মাছের চাষ অন্তর্ভুক্ত হয়নি; আর পশুপালন যা ছিল তা কমিয়ে এমন করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে কৃষকেরা কৃষি গ্রাজুয়েটদের কাছ থেকে পশুপালন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান পাবেন কি–না যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

**অধিভুক্ত কলেজ সিস্টেম ঃ** অধিভুক্ত কলেজ সিস্টেমে ৩টি কলেজ/ ইন্সটিটিউট যথাঃ বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট, ঢাকা (১৯৩৮), পটুয়াখালী কৃষি কলেজ (১৯৭৮) ও হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ দিনাজপুর (১৯৮৮) স্নাতক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা দিয়ে আসছে। কলেজগুলো দ্বৈত শাসনের শিকার। প্রশাসনিক দিক থেকে এগুলো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আর একাডেমিক দিক থেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং কৃষি অনুষদের কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করে থাকে। কলেজগুলোর স্বায়ত্তশাসন বলতে কিছু নেই; কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে এগুলোর একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলে।

কৃষি কলেজগুলোর উন্নয়নের ব্যাপারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কোনরূপ ভূমিকা পালন করেনি। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলো যেভাবে অধিভুক্ত, কৃষি কলেজগুলোকেও সেভাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাখা হয়েছে। অর্ডিন্যান্স স্টেটিউটস্ মোতাবেক অধিভুক্ত কলেজগুলোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে পরীক্ষার তারিখ জানিয়ে দেয়া। ছাত্রদের খাতা পরীক্ষা করা, ফলাফল প্রকাশ করা, মার্কশীট বিতরণ করা আর যারা সফলভাবে কোর্স সমাপ্ত করেছেন তাদের সনদ বা সার্টিফিকেট প্রদান করা। কলেজগুলোর শিক্ষকদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কমিটি বা পরিষদে অংশ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কৃষি কলেজগুলোর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে মর্যাদা থাকার কথা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা কখনও স্বীকার করেনি। আর তাই কৃষি শিক্ষা কার্যক্রম, সিলেবাস প্রণয়ন, কৃষি শিক্ষা পরিকল্পনায় কৃষি কলেজগুলোর অবদান রাখার সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত মর্যাদাও ক্ষত–বিক্ষত। উপরন্তু একই সিলেবাস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুসরণের ফলে কৃষি শিক্ষা উন্নয়নে কোন প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেনি; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের একক প্রাধান্য বজায় থাকছে। ফলে কৃষি শিক্ষা যুগোপযোগী বিকাশ লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

কৃষি কলেজগুলোর অবকাঠামো ও ফেসিলিটিজ উন্নয়নে একমাত্র বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানেরই দায়িত্ব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণার দায়িত্ব হচ্ছে কলেজগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করা, তাদের পদোন্নতি ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সহায়ক শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ করা, গবেষণাগারের সংস্কার ও নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা, ছাত্র–শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থা করা, কলেজ সংলগ্ন কৃষি ফার্মের আধুনিকায়ন করা ইত্যাদি। বিগত ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত একমাত্র কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও অর্পিত দায়িত্ব পালনে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে ১৯৩৮ সালের অবকাঠামো ও সুযোগ–সুবিধা নিয়েই বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে আর ব্যাহত হচ্ছে কৃষি শিক্ষা কার্যক্রম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণামূলক কর্মকান্ডেই ব্যস্ত থাকে। কৃষি শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি বাস্তব দৃষ্টি দেয়া এর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে ইতিমধ্যে আরো দু'টি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ কথা আজ প্রমাণিত যে, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধীন থেকে কৃষি শিক্ষার উন্নতি কখনও হতে পারে না। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন মহাপরিচালকও এই অভিমত প্রকাশ করে কৃষি শিক্ষাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। অধিভুক্ত কলেজ সিস্টেমে উচ্চ কৃষি শিক্ষার যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতাবিহীন একচেটিয়া কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরী করছে যা বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সমস্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২। বাংলাদেশে কৃষির সমন্বিত খামার পদ্ধতি (Integrated Farming system) বিদ্যমান থাকলেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলামে শস্য উৎপাদন, পশু–পাখী পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতির সমন্বয় করা হয়নি।

৩। কৃষি কলেজগুলোর শিক্ষকবৃন্দের প্রশ্ন করা ও উত্তরপত্র পরীক্ষা করার সুযোগ নেই বলে ছাত্র–ছাত্রীরা শিক্ষকদের পাঠদানের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সাজেশন সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকে। এতে শিক্ষকবৃন্দ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন।

৪। শিক্ষাদানের ব্যাপারে কলেজগুলোর শিক্ষকদের কোন স্বাধীনতা নেই। অনেকগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে না থাকাতে শিক্ষকবৃন্দ পড়াতে পারেন না। অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের সিলেবাস বহির্ভূত পাঠদানে কোন অসুবিধা নেই। কারণ তারাই প্রশ্ন করেন এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন।

৫। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ কলেজগুলোর শিক্ষকদের ক্যারিয়ার উন্নয়নের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নেয়ার ফলে শিক্ষকদের গবেষণাধর্মী মনোভাব গড়ে উঠেনি। তাই তারা বলতে গেলে গবেষণাবিমুখ।

৬। কলেজগুলোর প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকাতে ছাত্রদেরকে মাঠ সফরে (Field visit) নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মাঠ সফর খুবই গুরুত্বের সাথে করানো হয়।

**সুপারিশ ঃ** কৃষি কলেজগুলোর সাথে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের যে দায়সাড়া গোছের সম্পর্ক তাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে কলেজ সিস্টেমে কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং কৃষি কলেজগুলোর অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। এ জন্য সর্বাগ্রে যা দরকার তা হচ্ছে কলেজগুলোর পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।

একটু ভাল করে তাকালেই আমরা দেখবো বিশ্বের আর কোথাও অধিভুক্ত কলেজ সিস্টেমে কলেজ প্রশাসনকে অন্য আর একটি প্রশাসনের অধীন রেখে কৃষি শিক্ষা দেয়া হয় না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কোন অধিভুক্ত কৃষি কলেজ নেই। সেখানে ২২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। নেদারল্যান্ডের ১৩টি কৃষি কলেজ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে স্বাধীনভাবে কৃষি শিক্ষা দিচ্ছে। ইংল্যান্ডের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ আছে। তদুপরি স্বায়ত্তশাসিত কৃষি কলেজও রয়েছে। জাপানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেশ কিছু সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি অনুষদ রয়েছে। উন্নত বিশ্বের কৃষি শিক্ষার এসব উদাহরণ থেকে আমরা বাংলাদেশের কৃষি কলেজগুলোর স্বায়ত্তশাসনের জন্য দু'টি প্রস্তাব করে আসছি। এক ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি বা বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি–এর অনুরূপ স্বায়ত্তশাসন। দুই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউয়েন্ট কলেজ (যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইন্সটিটিউট, ফাইন আর্টস ইন্সটিটিউট, ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি) বা কৃষি অনুষদ হিসেবে অন্তর্ভুক্তি। এ দু'টি প্রস্তাবের যে কোন একটি প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করতে পারেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউটকে কৃষি অনুষদ হিসেবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কতিপয় ব্যক্তির বিরোধিতার কারণে সে মহৎ উদ্যোগ অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, ১৯৮৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউটসহ কৃষি কলেজগুলোর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সরকার কৃষি কলেজগুলোর স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি কৃষি শিক্ষা সেল (Cell) বা উইং গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন যা ছাত্র–শিক্ষকদের কাছে অনভিপ্রেত। এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে বর্তমান অবস্থা থেকেও শোচনীয় হবে বলে অনেকেই ধারণা করেন। এমতাবস্থায় প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, কৃষি কলেজগুলোকে নিকটবর্তী সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ ফ্যাকাল্টিতে রূপান্তরিত করা হোক। এই ব্যবস্থাধীনে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউয়েন্ট কলেজ বা পূর্ণ ফ্যাকাল্টিতে রূপান্তরিত করা যেতেপারে।

এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে যে সব সুবিধা লাভ করা সম্ভব তা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১। দেশে প্রতিযোগিতামূলক কৃষি শিক্ষার সূচনা হবে এবং গুণগত মানের কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরী সম্ভব হবে।

২। শিক্ষকগণ গবেষণা করার সুযোগ পাবেন। এই সুযোগ পেলে জ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হবে, যা ছাত্রদের শিক্ষণেও প্রভাব ফেলবে।

৩। বিভিন্ন কৃষি পরিবেশের আঞ্চলিক ভিত্তিতে (Agro-ecological zone) সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলাম উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্ররা জ্ঞান অর্জন করতেপারবে।

৪। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও মেধার যথোপযুক্ত মূল্যায়ন সম্ভব হবে এবং তাদের উচ্চ শিক্ষার রুদ্ধ দ্বার উন্মোচিত হবে। আর শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার বৈষম্যের অবসান হবে।

৫। কলেজগুলোর শিক্ষা বিভাগগুলোকে বেশী মাত্রায় লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া সম্ভব হবে, যাতে ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, পুস্তক– এ সবের অভাব না হয়।

আমরা আশা করি সরকার প্রস্তাবটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন।

● (লেখক বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা–এর সহযোগী অধ্যাপক)